সংবাদ ১৪ সিপ্টেম্বর

তারিখ 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বয়স্ক সাক্ষরতা : সরকারি উদ্যোগের পর্যালোচনা

আ.ন.স. হাবীবুর রহমান

বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। চল্লিশের দশক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, আবার কোনও কোনও স্থানে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। গোড়ার দিকে পড়া ও লেখার দক্ষতাকেই বয়স্ক শিক্ষা মনে করা হতো। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সবুজ বিপ্লবের ঢেউ এ দেশে পৌঁছে। আর তখন বয়স্ক শিক্ষার পরিধি আরও ব্যাপক হয়। উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাষ, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এসব বিষয় বয়স্ক শিক্ষায় যোগ হয়। কৃষি, সম্প্রসারণ কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মীসহ নানা পদবির কর্মীদের মাধ্যমে এই শিক্ষা পরিচালনা শুরু হয়। ওই সময় রেডিও, বায়োস্কোপসহ নানা প্রচার মাধ্যমেরও ব্যপ্তি ঘটে। সবুজ বিপ্লবের উন্নয়ন মডেলকে সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার আয়োজন চলে। এসব ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের প্রদর্শনীও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ধনী গরিবের মধ্যে বিরাট বৈষম্য তৈরি হলেও সবুজ বিপ্লবের ডাক কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষকে যথেষ্ট শিক্ষিত করতে পেরেছে। এর ফলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, গম চাষ শুরু হয়েছে, আলু, টমেটো, কপিসহ উন্নত জাতের সবজি চাষে কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানুষের সচেতনতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। পুকুর, নদী ও কুয়ার পানি পান করার বদলে নলকূপের পানির ব্যবহার শুরু পায়। প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা অনেকাংশে হ্রাস পায়। গ্রামীণ ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ সুযোগ তৈরি হয়। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগ আর মহামারী আকারে দেখা দেয় না। প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। ফলে মানুষের গড় আয়ুও বাড়তে শুরু করে।

সবুজ বিপ্লবের মডেলটি ষাটের দশকে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে একীভূত হয়। আর সে সময় থেকে বয়স্ক শিক্ষা আলাদা একটি সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। ষাটের দশকে কুমিল্লায় সাক্ষরতা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি সার্থকভাবে পরিচালিত হয়। ওই সময় কুমিল্লায় বয়স্ক শিক্ষার উপ-অধিদপ্তর খোলা হয়। কুমিল্লা থেকে নতুন পদ্ধতির বয়স্ক সাক্ষরতা উপকরণ এবং অব্যাহত শিক্ষার জন্য দেশের চাহিদা মাফিক অনেকগুলো উপকরণও প্রকাশিত হয়। সে সময়কার ওই পদ্ধতি কুমিল্লা পদ্ধতি নামে দেশ বিদেশে খ্যাত ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কুমিল্লা পদ্ধতির বেশকিছু উপকরণ বেসরকারি সংস্থাগুলো ব্যবহার করলেও সরকারিভাবে আর সেই কর্মসূচি পরিচালিত হয়নি। ষাটের দশকের কুমিল্লা পদ্ধতি বিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের নিকট অনুসরণযোগ্য একটি পদ্ধতি হতে পারত। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার সামগ্রিকভাবে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতার পরপর বঙ্গবন্ধু বয়স্ক সাক্ষরতার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য বয়স্ক সাক্ষরতাকে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাও রচিত হয়েছিল। এটি বাস্তবায়নে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন বয়স্ক সাক্ষরতা বিষয়ক একটি বড় পরিকল্পনা হাজির করে। কিন্তু দেশে বয়স্ক সাক্ষরতা সম্প্রসারণের মতো বিশাল দায়িত্ব পালন করার কোনো অবকাঠামো জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ছিল না। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল এর ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমগ্র জনগণ এবং বঙ্গবন্ধুর মতো অবিসংবাদিত নেতা থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বকে অবাক করে দেয়ার মতো সুযোগটি এমনিভাবে হারালাম।

স্বাধীনতার পরে বয়স্ক শিক্ষায় সরকারি ভূমিকাকে প্রশংসা করার আর কিছুই থাকল না। সরকারি ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট শূন্যতার সময়ে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনার নেতৃত্বে আসে। কুমিল্লা পদ্ধতির উপকরণ দিয়েই মূলত বেসরকারি সংস্থাগুলো সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। গত তিন দশক যাবৎ সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনেক সংস্থাই গবেষণাধর্মী কাজ করেছে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বব্যাপী বয়স্কদের জন্য বিমুক্ত শিক্ষার প্রশ্নটি সামনে আসে। ব্রাজিলিয়ান দার্শনিক ও শিক্ষণতত্ত্ববিদ পাওলো ফ্রেইরি (১৯২২-৯৭) প্রধানত ওই মতবাদের প্রবক্তা। ওই মতবাদ অনুযায়ী বয়স্কদের শিখনে শিক্ষকের একমুখী প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়। বলা হয়, বয়স্করা নিজেদের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমেই শিখবে। শিক্ষা পরিচালনাকারী সেই সংলাপে অংশ নেবেন এবং তিনি নিজেও অন্যদের কাছ থেকে শিখবেন। ফ্রেইরির মতবাদ অনুযায়ী সাক্ষরতা মানে কেবল লেখাপড়াই নয়, শিক্ষার বিষয় এমন হবে যা নিজেকে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষার্থীর মস্তিস্কে অনুরণের সৃষ্টি করে। এই মতবাদ দ্বারা বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনাকারীরা সাক্ষরতাকে অন্যায্যতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতার পর থেকে বয়স্ক শিক্ষার মূলধারাটিকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোই লালন ও বিকশিত করে আসছে। এ কাজটি যথেষ্ট শ্রমসাধ্য হওয়ার কারণেই তিন দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ত্রিশ লাখ নারী ও পুরুষকে সাক্ষর নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় যা মোট নিরক্ষর জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্যই বটে। সংখ্যায় কম হলেও বিমুক্ত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তারা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিতভাবে বয়স্ক সাক্ষরতার কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন সব শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে আছে– এফআইভিডিবি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ব্র্যাক, প্রশিকা, জাগরণী চক্র, ভার্ক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস, সিসিডিবি, কোডেকসহ বেশকিছু সংস্থা।

দেশের বেশিরভাগ মানুষকে সাক্ষর করার জন্য আমাদের দেশে অতীতে অনেক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ১৯৮০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক বয়স্ক সাক্ষরতা অভিযানের ঘোষণা দেন। এ জন্য ছাপানো হয়েছিল এক কোটি বই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে দু'জন নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার চেয়ারম্যানদের জন্যও বয়স্ক শিক্ষা প্রদান প্রায় বাধ্যতামূলক করা হয়। ওই সময়টিতে যা ঘটেছে তা দেশবাসী সবাই জানে। ছাত্ররা লেখাপড়া জানা আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে পরীক্ষকের সামনে হাজির হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রতিমাসে সাক্ষর নারী পুরুষের সংখ্যা জানিয়ে অসত্য প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে এবং গণশিক্ষার বইয়ের কাগজে দিয়ে ঠোঙ্গা বানিয়ে জিনিস বেচাকেনা চলেছে। এ অভিযানের মাধ্যমে ৪২ লাখ নারী পুরুষকে সাক্ষর করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হয় তা ১৯৮৪ সালের আদমশুমারীতে তার প্রতিফলন ছিল না। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শুরু করা গণশিক্ষা অভিযান ১৯৮৩ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৭ সালে সরকারিভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে ছোট একটি প্রকল্প শুরু হয়। ১৯৮৯ সালের গণশিক্ষা কার্যক্রমের দাতা সংস্থা ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে জড়িত করে কারিকুলাম প্রণয়ন ও উপকরণ রচনার ওপর জোর দেয়। আর সে আলোকেই দেশের বেসরকারি সংস্থার কারিকুলাম ও প্রকল্প বিশেষজ্ঞরা এতে সংশ্লিষ্ট হন। দেশের এই অভিজ্ঞ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা ১৯৯০ সালে বিনা পারিশ্রমিকে 'চেতনা' নামে বয়স্ক সাক্ষরতার উপকরণ রচনা করেন। ওইসব উপকরণ রচনায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছবি, অক্ষরের পরিচয়, নিয়ন্ত্রিত শব্দ, আলোচনা ইত্যাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সীমিত সংখ্যায় চেতনা বইয়ের সেট মুদ্রণ করে উপকরণ প্রণেতাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ পরীক্ষার মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিমার্জন করা হবে। কিন্তু দেখা গেল, উপকরণের আয়তন কমানোর জন্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই যেনতেনভাবে 'চেতনা' প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে নিয়ন্ত্রিত শব্দভাণ্ডার প্রয়োগের উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হয়। ১৯৯০ সালে গণশিক্ষা কার্যক্রমই পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামে পরিচালিত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এটি একটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয় যার নাম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিএনএফই)। বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে অধিদপ্তরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু এটি বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক, তাই বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই তা পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল।

> দেশের বেশিরভাগ মানুষকে সাক্ষর করার জন্য আমাদের দেশে অতীতে অনেক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ১৯৮০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক বয়স্ক সাক্ষরতা অভিযানের ঘোষণা দেন। এ জন্য ছাপানো হয়েছিল এক কোটি বই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে দু'জন নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার চেয়ারম্যানদের জন্যও বয়স্ক শিক্ষা প্রদান প্রায় বাধ্যতামূলক করা হয়। ওই সময়টিতে যা ঘটেছে তা দেশবাসী সবাই জানে। ছাত্ররা লেখাপড়া জানা আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে পরীক্ষকের সামনে হাজির হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রতিমাসে সাক্ষর নারী পুরুষের সংখ্যা জানিয়ে অসত্য প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে এবং গণশিক্ষার বইয়ের কাগজে দিয়ে ঠোঙ্গা বানিয়ে জিনিস বেচাকেনা চলেছে। এ অভিযানের মাধ্যমে ৪২ লাখ নারী পুরুষকে সাক্ষর করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হয় তা ১৯৮৪ সালের আদমশুমারীতে তার প্রতিফলন ছিল না।

বিদেশী দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ প্রদান করে এনজিওগুলোর দিয়ে কর্মসূচি পরিচালনার নামে ডিএনএফই দেশীয় দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দেশের এনজিওগুলোর সক্ষমতা বিবেচনার জন্য এনজিওগুলোর সমন্বয় প্রতিষ্ঠান গণসাক্ষরতা অভিযান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও ব্যুরো যৌথভাবে দায়িত্ব নিতে পারে। তা না করে পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞাপন দিয়ে কিছু কাগজপত্র দাখিল করার মধ্য দিয়ে প্রকল্প পাওয়ার প্রতিযোগিতাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে যে সব সংস্থা বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা করছে তারা টেন্ডারের মাধ্যমে প্রকল্প প্রাপ্তি প্রতিযোগিতায় নামতে রাজি নয়। আর এই প্রথাটিই আসলে বয়স্ক শিক্ষার মতো অংশগ্রহণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্তরায়। ২০০৫ সালে ডিএনএফই বিলুপ্ত হয় এবং ওই সময় থেকে সরকারিভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না যা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বয়স্ক সাক্ষরতা পরিচালনা একটি কঠিনতম দায়িত্ব। সাক্ষরতা কোর্সটি যদি নয় মাসের হয় তাহলে সপ্তাহে ছ'দিন ন্যূনতম আড়াই ঘণ্টা হিসেবে উপস্থিত না হয়ে সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এ রকম নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে শিক্ষা দল সংগঠন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের মধ্যে সংগঠন বিনির্মাণে কাজ করে এমন সব সংস্থা ছাড়া বয়স্ক শিক্ষার বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই ছোট ছোট সংস্থা কাজ করতে পারে। কিন্তু তাদের সক্ষমতা তৈরিতে খুবই অভিজ্ঞ সংস্থার সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন।

বয়স্ক সাক্ষরতা পরিচালনায় সমগ্র প্রক্রিয়াকে কোনও বিশেষ প্রশাসকের আইন দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযান (টিএলএম) নামে বিভিন্ন জেলায় সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শেষে ওই জেলায় ৮০ থেকে ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জনের দাবি করা হয়েছিল। যদি সত্যিই এমন হতো তা হলে তা জাতির জন্য খুবই কল্যাণকর ছিল। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। গণতন্ত্র অনেকদিন চললে এক সময় এ দেশে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে যা সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযান ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সব স্তরের মানুষকে একই মঞ্চে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষরতার কার্যক্রম চালাতে হবে দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করেই। সমন্বিত সাক্ষরতা কর্মসূচির মতো সম্মোহনকারী শব্দ দ্বারা তা অর্জন করা যাবে না।

জাতীয়ভাবে বয়স্ক কার্যক্রম সাক্ষরতা পরিচালনার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন, সে ব্যাপারে এখানে কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলো–

এক. সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এ দেশে এনজিওগুলোর অনেকে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। তাদের সাফল্য দেশের বাইরেও স্বীকৃতি পেয়েছে। কাজেই জাতীয়ভাবে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনার নেতৃত্বে তাদের নিয়ে আসতে হবে।

দুই. অভিজ্ঞ এনজিও কর্মীরা কারিকুলাম ও উপকরণ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৯০ সালের সেই উপকরণ মাঠ পরীক্ষা করা হয়নি। বর্তমানে জাতীয় ও বিশ্ব পরিসরের চাহিদা বদলেছে। একবিংশ শতাব্দীর চাহিদাকে সামনে রেখে নতুন উপকরণ তৈরি করতে হবে। যারা মাঠ পর্যায় থেকে বয়স্ক সাক্ষরতায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন এমন সব কুশলীদেরই উপকরণ রচনার দায়িত্ব দিতে হবে। যে সব সংস্থার মানসম্পন্ন সাক্ষরতা উপকরণ আছে সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগও থাকতে হবে।

তিন. দল সংগঠন থেকে শুরু করে মূল্যায়ন পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া মেনে চলেই বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট অথচ কম সংখ্যক মানুষের সাক্ষরতা অর্জন অধিক সংখ্যক লোকের নিম্নমানের অংশগ্রহণ থেকে উত্তম। কাজেই গুণগত মানসম্পন্ন সাক্ষরতা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

চার. অধুনা বিলুপ্ত ডিএনএফইকে পুনরুজ্জীবিত করা হোক এবং ডিএনএফইকে কারিগরি সহায়তার জন্য সমন্বয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেখে সব ধরনেরর আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ট্রাস্ট গড়ে তোলা হোক। ট্রাস্টি বোর্ড আর্থিক অনিয়ম ও অপচয় বোধ করতে সহায়ক হবে।

পাঁচ. দেশের বয়স্ক শিক্ষায় অতীতের কার্যক্রম বিষয়ে এমন একটি মূল্যায়ন করা হোক যা আমাদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সমর্থ করে। বিদেশী দাতাদের আকৃষ্ট করার মতো উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

ছয়. নিকট ভবিষ্যতে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে তা এমনসব এনজিওগুলোকে দেয়া হোক যারা তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সক্ষম। টেন্ডারের মাধ্যমে প্রকল্প প্রদানে বিদ্যমান রীতি পরিবর্তন করে সক্ষমতার মাত্রানুযায়ী সংলাপের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা উচিত। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন বা টিএলএম দ্বারা সাক্ষরতার অর্জনের দাবি জাতির স্বার্থেই পরিত্যাগ করতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষার বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কখনও এটি নিশ্চিত করতে পারে না। আমলাতন্ত্রের মধ্যে কারও প্রতি মুগ্ধতা দেখিয়ে আসলে তেমন কোনও লাভ নেই। সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে। আর এটিকে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দ্বারাই নিশ্চিত করা যায়।

[লেখক : সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞ]